Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501006

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Assam's Ankia Nat and Its Performance Style: A Brief Overview

অসমের অঙ্কীয়া নাট ও তার অভিনয় শৈলী : একটি সংক্ষিপ্ত আভাস

Dr. Soma Acharya
Associate Professor
Bengali Department
Kachhar College, Silchar, Assam

Received on: 09th March 2026
Accepted on: 20th March 2026

Abstract:
Various provinces of India possess distinct theatrical traditions, each enriched by the art, culture, and regional values of its respective region. Assamese Ankiya Nat stands as one such theatrical form. Originating in medieval Assam against the backdrop of the Bhakti movement, this dramatic style has played a pivotal role in establishing the currents of Assamese society, culture, and artistic sensibilities on the global stage in a renewed form. Through mediums such as 'Ankiya Bhaona', 'Satra culture', and 'Sattriya dance', this theatrical tradition continues to enrich the unique heritage of Assam. The present article endeavors to provide a brief overview of the religious objectives, performance style, and distinctive characteristics of Ankiya Nat.

Key Words:
Ankiya Nat, Nam dharma, Bhakti movement, Satra culture, Folk drama.

মূল প্রবন্ধ

মধ্যযুগের অসমে বৈষ্ণব আন্দোলনের পটভূমিতে সৃষ্ট বিশেষ কলাকৌশল পূর্ণ একধরনের ধর্মমুলক পালাকে 'অঙ্কীয়া নাট' বলা হয়। অসমে 'নামধর্মের' প্রচারক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ছিলেন এই নাট্য শৈলীর জন্মদাতা। শঙ্করদেব এই নাট্য শৈলীর প্রবর্তক যদিও, তিনি তাঁর রচনায় কোথাও 'অঙ্কীয়া নাট' শব্দ দুটি ব্যবহার করেন নি। 'অঙ্কীয়া নাট' নামকরণটি শঙ্করদেবের পরবর্তীকালের নাট্য সমালোচকদের দেওয়া। কারণ যে সৃজনী প্রতিভা ও শৈল্পিক দক্ষতা নিয়ে শঙ্করদেব এই নাট্য শৈলী সৃজন করেছিলেন, পরবর্তীকালের নাট্যকারদের মধ্যে সেই দক্ষতা ছিল না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল শঙ্করদেবের রচনার অনুকরণ। তাই শিথিল অনুকরণধর্মী রচনাগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তীকালের নাট্য সমালোচকগণ 'অঙ্কীয়া নাট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।[১]

'অঙ্কীয়া নাট' ভক্তি আন্দোলনের ফসল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মতো অসমিয়া জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'নামধর্ম' প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সচেতক শঙ্করদেবের লক্ষ ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিজের ভাবদর্শকে পৌছে দেওয়া। আর এর জন্য তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন নৃত্য গীত ও অভিনয় সমৃদ্ধ নাট্য শিল্পের। সমৃদ্ধ সংস্কৃত নাট্যশৈলী ও অসমের লোকায়ত সমাজে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত পুতুলনাচ, ওঝাপালি, ভারীগান,

© Santiniketan Sahityapath

কুশালগান, ঢুলিয়া, দেওধনী নৃত্য ইত্যাদি নানা ধরণের নাট্যধর্মী অনুষ্ঠানের অনুসরণে শঙ্করদেব এই নতুন নাট্য শৈলী সৃজন করেছিলেন। অসমিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে শঙ্কারদেবই প্রথম ব্যাক্তি যিনি পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রচলন করেছিলেন। এবং শঙ্করদেব নির্দেশিত পথেই পরবর্তীকালের অসমীয়া নাট্য সাহিত্য বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মোট সাতটি পালা রচনা করেছিলেন। (১) চিহ্ন যাত্রা, (২) পত্নী প্রসাদ, (৩) কালিয় দমন, (৪) কেলি গোপাল, (৫) রুক্মিণী হরণ, (৬) পারিজাত হরণ, (৭) রাম বিজয়। 'চিহ্নযাত্রা'র কোনো পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবে 'কথাগুরু চরিত গ্রন্থগুলিতে 'চিহ্নযাত্রা' অভিনয়ের উল্লেখ আছে। 'চিহ্নযাত্রা' সম্পর্কে চরিতকারদের বিবৃতি থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে ভক্তদের একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক প্রেমকে উপেক্ষা করতে না পেরে শঙ্করদেব একটি অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে তিনি নিজেও অভিনয় করেন। 'কথাচরিত'কার রামচরণ ঠাকুরের রচনা থেকে জানা যায়:

"বৈকুন্ঠ নগর পটতে লেখিয়া
অঙ্ক করিলম্ত তার।।
ধেমালির ঘোষা প্রথমে লিখিল
দুটিয় শ্লোক রচিল।
সূত্র ভটিমাক গীতক করি য়া
চিন সব বিভাগিল।।
যার যেন থান যিমত লক্ষণ
কল্পতরু উপবন ।
সরোবর চয় অধিকে শোভয়
অনন্ত শয্যা শোভন।।" (শঙ্করচরিত, রামচরণ ঠাকুর)

শুধু তাই নয়, চরিতকারদের মতে 'চিহ্নযাত্রা'র অভিনয় রসে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ সেদিন দিনরাত্রের পার্থক্য ভুলে গিয়েছিল:

"না জানিল সভাসদে কিবা রাত্রিদিন
দেখি বৈকুন্ঠক যেন পাপ ভৈল ক্ষীণ।।
নারীজন নিচিনয় কোন জন স্বামী
সবে হন্তে যেহেন ভৈলন্ত মোক্ষগামী।।" (শঙ্করচরিত, রামচরণ ঠাকুর)

চরিত পুঁথির বর্ণনা অনুযায়ী চিহ্নযাত্রা পালাতে একজন গায়ক গীতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পালা পরিবেশন করেছিল এবং সংশ্লিষ্ঠ চরিত্ররা নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে সেই বক্তব্যকে রূপায়িত করেছিল। চরিত্রগুলোর মুখে কোনো সংলাপ ছিল না। অনেকটা কেরালার 'কথাকলি' ও কর্ণাটকের 'যক্ষগান'এর মতো।

'চিহ্নযাত্রার' অভূতপূর্ব সাফল্য পরবর্তীকালে অসমের নাট্য শিল্পকে ভক্তি ধর্ম প্রচারের কার্যকরী মাধ্যমরূপে গ্রহণের পথকে সুগম করেছিল। 'চিহ্নযাত্রা'তে সংস্কৃত নাট্যরীতি মেনে পূর্বরঙ্গের ব্যবহার, সূত্রধারের উপস্থিতি, মঞ্চে পটচিত্রের ব্যবহার ইত্যাদির পাশপাশি লোকায়ত নাট্য শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত গায়েন-বায়েন, ধামালী, চরিত্র অনুযায়ী মুখোশের ব্যবহার, গীত-নৃত্য-বাদ্য ইত্যাদির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ পরবর্তীকালে অসমিয়া নাট্য সাহিত্যে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। তবে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনির চিত্রপট অঙ্কন করে প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে অভিনয় করা সহজ সাধ্য ছিল না বলে শঙ্করদেব তাঁর বাকী ছয়টি পালাতে চিত্রবর্জিত কাহিনি ও সংলাপের সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। তাই বিষয়গত ঐক্য ছাড়া 'চিহ্নযাত্রা'র সঙ্গে শঙ্করদেবের অন্যান্য পালাগুলির শৈলীগত খুব একটা মিল নেই। অঙ্কীয়া নাটের বিষয়বস্তু ভাগবত ও পুরাণ আশ্রিত তাই কাহিনির ভাবগত বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে চরিত্রগুলির নির্মিত। তবে বিষয়ের প্রয়োজনে শঙ্করদেব তাঁর পালাগুলিতে কিছু মৌলিক চরিত্রের ও সংযোজন ঘটিয়েছিলেন।

সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নাট্যশৈলীর বৈশিষ্ট হলো পালাগুলির কাহিনিতে একটি বক্তব্যকে তিন ধরনের প্রকাশ করা। সূত্রধারের শ্লোক, চরিত্রের সংলাপ এবং গীতের মাধ্যমে একই ভাবকে বার বার ব্যক্ত করার ফলে কাহিনির গতি কিছুটা শিথিল ছিল।

তবে এ ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা নাট্যকার চেষ্ঠা করেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিজের ভাবাদর্শকে পৌঁছে দিতে। সমাজ সচেতন শঙ্করদেব এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অভিনয়-স্থল হলো এমন একটি জায়গা যেখানে সর্বস্তরের মানুষের প্রবেশের অধিকার থাকে। তাই সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতবর্গ শ্লোকের মাধ্যমে, এবং সাধারণ জনগণ সংলাপের মাধ্যমে, এবং সংগীতপ্রেমীরা যাতে গীতের মাধ্যমে নাট্যরস উপভোগ করতে পারেন সেদিকে নাট্যকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

সংগীতের প্রাচুর্য শঙ্করদেবের নাটকের অন্যতম গুণ। এবং এটি প্রাচীন অসমিয়া-কলা সংস্কৃতি থেকে শঙ্করদেবের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। প্রাক্-শঙ্করী অসমিয়া সাহিত্য ছিল মূলত গীতি সাহিত্য। মাধব কন্দলির রামায়ণ যে সুর করে পড়া হতো কিংবা রস সংযোগে গীত হতো ইতিহাসে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অসমিয়া সংগীত চর্চার ইতিহাসে ষোড়শ শতকের দুর্গাবরদাস কায়স্থর মনসাগীত ও গীত রামায়ণের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। অঙ্কীয়া নাটের পালগুলিতে নাটকীয় চরিত্র সমূহের বিবিধ কার্যাবলি ছাড়াও মানবিক ভাবপ্রকাশের জন্য গীতের ও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পালাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধির পিছনেও এই গীত সমূহের অবদান যথেষ্ট। 'কেলি গোপাল' পালাতে সর্বমোট বত্রিশটি গীতের সন্নিবেশ ঘটেছে। পালাতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি গীতের তালের ও নাম পাওয়া যায়। শংকরদেবের ছয়টি পালাতে মোট ১১৯টি গীত আছে। গানগুলিতে ঊনত্রিশটি রাগের নাম পাওয়া যায়। রাগগুলি হলো: আশোয়ারী, ধনশ্রী, শ্রী গৌরি, নাট মল্লার, সুহাই, বসন্ত, কেদার, অহির, মাহুর, ধনশ্রী, তুর-বসন্ত, কল্যাণ, ভূপালী, সিন্ধুরা, কানারা, কৌ, বেলোয়ার, শ্রীগান্ধার, ভাটিয়ালী, পূরবী, কারুণ্য-কেদার, গান্ধার, সারঙ্গা, নাট, শ্যাম এবং শ্রী পয়ার ইত্যাদি।

অঙ্কীয়া নাটে ব্যবহৃত সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়মাবলি আছে। যেমন, পালার আরম্ভ সংগীত ও সমাপ্তি সংগীতের জন্য রাগ ও তাল নির্দিষ্ট থাকে। সেই অনুযায়ী নান্দীগীত সর্বদা সুহাই রাগের ও একতাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পালার মুখ্য চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশের গীত সিন্দুরা রাগের হয়, তবে কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও আছে। এবং পালার শেষে 'মুক্তিমঙ্গাল' গীতে। সাধারণত কল্যাণ ও পূরবী এই দুইটি রাগ 'খরমাণ' তালের সহযোগে গীত হয়। এছাড়া বিলাপের দৃশ্য কারুণ্য কেদার, শ্রী গান্ধার, সুহাই, তুর-বসন্ত, তুর-ভাটিয়ালী, ভূপালী ইত্যাদি রাগ সমৃদ্ধ গীত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনাতে কানারা, আশোয়ারী, তুর-নাট, মল্লার ইত্যাদি রাগ সমৃদ্ধ গীত ব্যবহৃত হয়েছে। অঙ্কীয়া নাটে সংগীত ব্যবহারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই নাট্যশৈলীতে অন্যান্য সমৃদ্ধ অংশবাদ দিয়ে কেবল গীতের রসাস্বাদ গ্রহণেও পালার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু অবগত হওয়া যায়।

অঙ্কীয়া নাটের অভিনয়কে বলা হয় 'অঙ্কীয়া ভাওনা'। যেহেতু শঙ্করদেবের মৌল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে গণসংযোগ স্থাপন করা। তাই এই নাট্যশৈলীতে সংস্কৃত নাট্যরীতিকে তিনি কিছুটা সরলীকৃত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অসমে প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাগত ভাবে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনাট্যধর্মী অনুষ্ঠানগুলিরও সাহায্য নিয়েছিলেন। এবং সংস্কৃত নাট্য আঙ্গিকের আধারে শিল্পসম্মত ভাবে অসমে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যশৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন।[২]

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা অসমিয়া লোকনাট্যানুষ্ঠান ওজাপালী, ঢুলিয়া, পুতুল নাচ, ভারী গান, বহুয়া, দোতরাগান ইত্যাদি লোকনাট্য ধর্মী অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রভাব অঙ্কীয়া নাট্যাভিনয়তে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। আবার মিথিলার 'কীর্তনীয়া নাট'র সঙ্গে কোথাও কোথাও অঙ্কীয়া নাটের অভিনয় শৈলীর পরোক্ষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় বলে কোনো কোনো সমালোচক মত পোষণ করেছেন।[৩]

অঙ্কীয়া নাট্যাভিনয়ে গীতের সঙ্গে নৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগীতের ক্ষেত্রে যেভাবে বিভিন্ন রাগ, তাল, লয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি নৃত্যের ক্ষেত্রে ও চরিত্র অনুযায়ী নৃত্য পরিবেশন নির্দিষ্ট করা থাকে। এখানে ধ্রুপদ ও লোকনৃত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। অঙ্কীয়া নাটের নৃত্য শৈলী 'সত্রীয়া নৃত্য' নামে জনপ্রিয়। ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন তাল যেমন চুটা, থুকনি, রূপক, সরু বিষম, রূপ-গান্ধার ইত্যাদির পাশাপাশি ঝুমুর, নাদুভঙ্গি, গোপীনৃত্য, মান-চোক নৃত্য (গায়েন বায়নের নৃত্য) সূত্রধারী নৃত্য ইত্যাদি লোকনৃত্যের প্রভাব ও অঙ্কীয়া নাটের নৃত্যশৈলীতে দেখা যায়। ধ্রুপদ ও লোকনৃত্যের সংমিশ্রণ অঙ্কিয়া নাটের নৃত্যশৈলীকে যে বৈচিত্র্য দান করেছে তা পরবর্তীকালে 'সত্রীয়া নৃত্য' নাম নিয়ে নৃত্য শিল্পের ইতিহাসে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অঙ্কীয়া নাটের উপস্থাপন রীতি অনেকটা বঙ্গের যাত্রা পালার মতো, অঙ্কীয়া নাটের অভিনয়ের জন্য প্রথমদিকে কোনো স্থায়ী মঞ্চ তৈরী হতো না। খোলা আকাশের নিচে, মুক্ত প্রাঙ্গণে চতুর্দিক ঘেরা আসরই ছিল এই নাট্যাভিনয়ের আদর্শ জায়গা। পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে অসমের বিভিন্ন বৈষ্ণব মঠগুলিতে যাকে 'সত্র' বলা হয় সেখানে অঙ্কীয়া নাট অভিনয়ের জন্য স্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হয়। কিংবা 'সত্র'গুলির মাঠে নির্মিত প্রার্থনা গৃহে বা 'নামঘর'এর চতুর্দিকে দর্শক পরিবেষ্টিত আসরে এই পালাগুলির অভিনয় হতো। তবে খোলা মাঠে দর্শক

পরিবেষ্টিত আসরই হলো 'অঙ্কীয়া ভাওনা' পরিবেশনের উপযুক্ত জায়গা। অঙ্কীয়া নাটের অভিনয়ের সময় সাধারণত রাত্রিকাল। প্রথম দিকে সন্ধ্যারাতে অভিনয় শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত অভিনয় চলত। এবং এই রীতি বহুদিন প্রচলিত ছিল। বঙ্গের যাত্রাপালার মতো এখানেওদর্শকের সন্তুষ্টির জন্য এক একটি পালাকে তিন-চার রাত ধরে অভিনীত করা হতো। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই নাট্য শৈলীতে অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছেদ ও সাজ-সজ্জাতে আঞ্চলিক বেশভূষা প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পৌরাণিক চরিত্রের অভিনয়ে চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার এই নাট্যশৈলীকে এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে।

অঙ্কীয়া নাটের প্রধান রস ভক্তিরস। কৃষ্ণভক্তি প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাট্যকারের স্বকীয় প্রতিভায় অঙ্কীয়া নাট্যশৈলী তার উদ্দেশ্য ধর্মিতাকে অতিক্রম করে নাট্যশিল্পের অন্যতম মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর গঠন বিন্যাস, অভিনয় প্রসঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে অসমের নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপ এত বেশি উদ্ভাসিত যা অঙ্কীয়া নাটের শৈল্পিক উৎকর্ষতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

যে বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শংকরদেব এই নাট্যশৈলীর জন্ম দিয়েছিলেন, তার শৈল্পিক উৎকর্ষতার জন্য পরবর্তীকালে শঙ্কর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ থেকে শুরু করে আপামর অসমিয়া জনগণের কলাকৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল অঙ্কীয়া নাট। শঙ্করদেবকে অনুকরণ করে পরবর্তীকালে যাঁরা অঙ্কীয়া নাট্য শৈলীর ধারায় নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শঙ্করদেবের শিষ্য মাধব দেব, গোপাল আতা, রামচন্দ্র আতা, লক্ষীদেব আতা, দ্বিজভূষণ, রামচরণ ঠাকুর, দৈতারি ঠাকুর প্রমুখ।

মধ্যযুগীয় ভারতে ভক্তি আন্দোলন একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনও ছিল। জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ বৈষম্য ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটি সমতা স্থাপনের প্রয়াস এই ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের হাত ধরে অসমে ভক্তিআন্দোলনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়েছিল। শুরুতেই বলেছিলাম যে অঙ্কীয়া নাট মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের ফসল। এবং নিজের এই উদ্দেশ্যকে সমাজের সর্বস্তরের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে তিনি লোকায়ত ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেছিলেন। শঙ্করদেব নিজে সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন যদিও তাঁর রচনায় সংস্কৃতের পাশপাসি তিনি আঞ্চলিক ভাষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে ঘটনার পরিকাঠামো পৌরাণিক হলেও ভাববস্তু ছিল সময়োপযোগী। সমালোচকের ভাষায়:

> **অসমের মাটি এবং অসমের জলে সাহিত্য প্রতিমা গড়ে তোলার কাজটি তাঁর [শঙ্করদেবের] সম্পূর্ণ নিজস্ব। স্থানীয় পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি পৌরাণিক কাহিনির কোনো অংশ বর্ধিত করেছেন, কোন অংশ ছেঁটে দিয়েছেন, আবার কখনো পাঠককে 'মধুমিশ্রিত দুগ্ধ'-র আস্বাদ করার জন্য একাধিক পুরাণকে মিলিয়ে একটি কাহিনি তৈরি করেছেন। পৌরাণিক কাহিনি গুলিকে তিনি এমন এক স্বাভাবিক ও ঘরোয়া রূপে অসমিয়া জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন যে সেগুলিকে অনুবাদ কিংবা 'অনা — অসমিয়া' বলে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল।** (আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ বর্তমান প্রাবন্ধিক কৃত) (শিবনাথ বর্মন: 'শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কৃতী আরু কৃতিত্ব', পৃ. ১৩৮)

লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অঙ্কীয়া নাট আজও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে আসছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে অসমের জাতীয় পরম্পরাকে খুঁজতে গেলে 'অঙ্কীয়া নাট'এর দ্বারস্থ হতে হয়। জন্মলগ্নে অঙ্কীয়া নাট্যাভিনয় প্রবর্তনের পেছনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণ বৈষম্যের কোলাহলে অস্থির অসমবাসীকে একই আশ্রয়ের ছায়াতলে সম্মিলিত করা। কিন্তু পরবর্তীতে অসমিয়া জনগণের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেরও অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অঙ্কীয়া নাট। অসমিয়া সমাজে অঙ্কীয়া নাট্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> **অনেকগুলি উপাদানের সংযোগে মহাপুরুষ শঙ্করদেব এই নতুন সুকুমার শিল্পকলার পথ খুলে দিয়েছিলেন। তারই অবিচ্ছিন্ন ধারা আজ পর্যন্ত একদিকে অসমিয়া সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অন্যদিকে জাতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে অসমিয়া জনগণের স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করে চলেছে।** (কেশবানন্দ দেব গোস্বামী: 'অঙ্কমালা', গুয়াহাটি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৮,)

তথ্যসূত্র:

১। অসমিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে অঙ্কীয়া নাট সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মহাপুরুষ দুজনের নাট্যে (শঙ্করদেব ও মাধবদেব) যে আঙ্গিক ও ভাষা প্রয়োগ হয়েছিল পরবর্তীকালের নাট্য রচয়িতাগণ তার থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। ব্রজাওলি পরিণত হলো নান্দিশ্লোক, ভাটিখা আদি ও লোপ পেল। ফলে মহাপুরুষ দুজনের 'নাট' বা সেই ধাঁচে ঢালা নাটক সমূহকে পরবর্তীকালের 'নাট'গুলি থেকে পৃথক করে দেখানোর নিমিত্তে 'অঙ্কীয়া নাট' বলা শুরু হয়। একটি অঙ্ক থাকার জন্যও 'অঙ্কীয়া নাট' কথাটি বড় নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ এই নাট্যগুলিতে কাহিনির স্তর চিহ্নিত করা অর্থ 'অঙ্ক' শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। আরম্ভ হয়েছে কিংবা 'অঙ্ক' শেষ হয়েছে বলে কোনো নাটে উল্লেখ নেই।" (আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ) 'অসমিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃ. ২৪

২। শঙ্করী সাহিত্য সংস্কৃতির একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও গবেষক ড: কেশবানন্দ দেব গোস্বামীর একটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক: "মহাপুরুষ শ্রী শঙ্করদেবই অসমে সরব প্রথম নাট অভিনয়ের প্রচলন করেন। তার আগে নাটকীয় গুণ লক্ষণ বিশিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান ছিল যদিও সেগুলো পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ের ছিল না। অনেকগুলো উপাদানের সংযোগে শঙ্করদেব এই নতুন একপ্রকার সুকুমার শিল্পচর্চার পথ খুলে দেন।" (আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ বর্তমান প্রাবন্ধিক কৃত) 'অঙ্কমালা', ড : কেশবানন্দ দেব গোস্বামী সম্পাদিত, পৃ. ১৮

৩। আদি মধ্যযুগের মিথিলার ইতিহাসে একধরণের অভিনেতা গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় যাদের 'জমাতি' বলা হতো। এদের দলের প্রধানকে বলা হতো নায়ক যিনি সূত্রধারের ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং মুখ্য পাত্রের ভূমিকাতেও। পুরুষকেন্দ্রিক এই অভিনেতাগোষ্ঠীতে মেয়েদের কোনো স্থান ছিল না। পুরুষেরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করতেন। এই অভিনেতা গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অভিনেতাদের সামাজিক বর্ণবিন্যাসকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। এদের দলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চামারের সমান স্থান ছিল। অঙ্কীয়ানাট্যাভিনয়েও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অঙ্কীয়া নাটের অভিনয়েও ঠিক একই ধরনের বৈশিষ্ঠ লক্ষ করা যায়। সমালোচক বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া এ সম্পর্কে লিখেছেন — "There were no professional actors; They were recruited from the villages. Assamese acting is thus the work of amateurs. unlike, however, the earlier Sanskrit theatre, the reputation of actors of an Assamese Bhawana was never low nor dishonourable. Even men of erudition, great artistic attainment and of high social, religious, and political status played roles in an Assamese 'Bhawana' without loss of prestige and honour." ('Ankiya Nat', B. K. Barua, 1983, p. xv)

সহায়ক গ্রন্থ এবং পত্রিকা:

১। 'পুরণি অসমীয়া সমাজ আরু সংস্কৃতি', ড. মহেশ্বর নেওগ, নিউ বুকস্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯২

২। 'অঙ্কমালা', ড. কেশবানন্দ দেব গোস্বামী সম্পাদিত, বনলতা প্রকাশন, ডিব্রুগড় ১, ১৯৯৯

৩। 'অঙ্কীয়া ভাওনা', ড. কেশবানন্দ দেব গোস্বামী, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১

৪। রামানন্দ দ্বিজ বিরচিত 'শ্রী গুরুচরিত', ড. মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, অসম

৫। 'অসমর লোকনাট্য', রাম গোস্বামী, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, অসম, ১৯৯১

৬। 'অসমত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন: ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', শরৎচন্দ্র নেওগ, বাণীমন্দির, গুয়াহাটি ৫, ২০০১

৭। 'অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের জিলিঙনি', হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, লয়ার্স বুকস্টল, গুয়াহাটি ১, ১৯৬৮

৮। 'শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কৃতী আরু কৃতিত্ব', শিবনাথ বর্মন, পুঁথিতীর্থ প্রকাশন, গোলঘাট ২১, অসম, ১৯৯৭

৯। 'শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আরু অসমীয়া প্রগতিশীল সাহিত্যর ঐতিহাসিক পরম্পরা', ড. রমেশ কলিতা, 'গরীয়সী' (অসমিয়া সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা) গুয়াহাটী, অসম, একাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা, জুলাই ২০০৪

১০। 'Ankiya Nat', Dr. B. K. Barua, (edited), Published by Govt. of Assam, Gauhati, 1983

১১। 'Sankardeva: Vaisnavite Saint of Assam', Brinchi Kumar Barma, Gauhati, 1962

১২। 'A Cultural History of Assam (early period)', B. K. Barua, Bina library, Gauhati-1, Vol-1, 3rd ed. 1986

—

© Santiniketan Sahityapath